বৃত্তিবৈষম্যে অবরুদ্ধ শৈশব

এম এইচ রবিন
০১ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

শৈশব মানেই ডানা মেলে ওড়ার দিন। যেখানে থাকবে অবারিত মাঠ, ধুলোবালি আর কৌতূহলী মনের অফুরান জিজ্ঞাসা। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরুনোর আগেই সেই রঙিন শৈশবকে পিষে ফেলছে 'বৃত্তি পরীক্ষা' নামক এক যান্ত্রিক জাঁতাকল। শিক্ষাবিদদের মতে, এই পরীক্ষা কোমলমতি শিশুদের প্রকৃত শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলার বদলে এক একজন শ্রান্ত 'পরীক্ষার্থী'তে রূপান্তরিত করছে। শিক্ষা প্রশাসনের এই নীতি একদিকে যেমন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোয় তৈরি করছে এক গভীর শিক্ষাগত বৈষম্য।

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সুপারিশ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিটি অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা (জেএসসি) বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা এবং জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এর আগেও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ মত দিয়েছেন, নির্ধারিতসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য আয়োজিত এই পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য বাড়াতে পারে। তাদের যুক্তি- বিদ্যালয়গুলো তখন কেবল নির্বাচিত কয়েকজন শিক্ষার্থীর ওপর বাড়তি মনোযোগ দেয়, ফলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা আরও পিছিয়ে যায়। অথচ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সবার শিখন নিশ্চিত করতে দুর্বল শিক্ষার্থীদেরই বেশি সহায়তা প্রয়োজন। তবে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জুনিয়র ও এবতেদায়ি বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন শিক্ষাবিদদের এই মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হননি। তিনি জানান, ঐতিহ্যগতভাবে হয়ে আসা বৃত্তি পরীক্ষা এই মুহূর্তে বন্ধ করার পক্ষে তিনি মত দিতে পারছেন না, তবে বিষয়টি ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজও বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত করতে চায় না সরকার; বরং এ সুবিধা কীভাবে আরও বিস্তৃত করা যায়, সে বিষয়ে ভাবা হচ্ছে।

সাফল্যের নেশা ও শহুরে উন্মাদনা : শহরের পরিবারগুলোতে বৃত্তি পরীক্ষা এখন আভিজাত্যের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। সন্তানের মেধার বিকাশের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বৃত্তির সাফল্য' লোকসমাজে জাহির করা। এই কৃত্রিম বাহবা পাওয়ার নেশায় অভিভাবকদের দৌড় শুরু হয় সাতসকালে। কোচিং সেন্টার আর প্রাইভেট টিউটরের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায় শিশুর প্রাণোচ্ছলতা। আর এই সুযোগে ফুলেফেঁপে উঠছে নোট ও গাইড বইয়ের রমরমা বাণিজ্য। পাঠ্যবইয়ের মলাট ছাপিয়ে বাজারের চটকদার গাইড বই এখন শিশুর নিত্যসঙ্গী, যা তাদের সৃজনশীলতাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করছে।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক শারমিন আক্তার স্বীকার করেন, 'আমরা চাই আমাদের সন্তান ভালো করুক। কিন্তু কখন যে ভালো করার চাপটা সামাজিক প্রতিযোগিতায় রূপ নেয়, বুঝতেই পারি না। আত্মীয়-স্বজনের সামনে বৃত্তির ফল দেখাতে পারলে একটা আলাদা স্বীকৃতি পাওয়া যায়।'

বড় মগবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠার পর থেকেই কিছু অভিভাবক শুধু বৃত্তির কথা ভাবেন। তখন নিয়মিত পাঠ্যবইয়ের চেয়ে কোচিংয়ের সিলেবাসই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।'

ঢাকার বনশ্রীর বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের সামনে অপেক্ষমাণ কয়েকজন অভিভাবক জানান, 'সবাই যখন দিচ্ছে, তখন আমার সন্তান পিছিয়ে থাকবে কেন? তাই কোচিংয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি।'

বৃত্তির মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কারণে নোট ও গাইড বইয়ের চাহিদা বেড়ে গেছে। নগরীর ফার্মগেট এলাকার একটি লাইব্রেরির এক বিক্রেতা বলেন, 'বৃত্তি পরীক্ষার মৌসুমে গাইড বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।'

তবে শিক্ষাবিদদের মতে, এই প্রবণতা শিশুদের সৃজনশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত শেখার আগ্রহকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বৈষম্যের বিষবাষ্প- শহর বনাম গ্রাম : এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি উঠে আসে শহর-গ্রামের বৈষম্য ঘিরে। জামালপুরের এক গৃহস্থালিশ্রমিক আলতাফুন নেসা বলেন, 'ছেলের পড়াশোনার ইচ্ছে আছে, কিন্তু মাসে কোচিং ফি দেওয়ার সামর্থ্য নেই। বই-খাতা কিনতেই কষ্ট হয়।' তার ছেলে ক্লাস ফাইভে পড়লেও বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আলাদা কোনো সহায়তা পায়নি।

রাজধানীর ভাষানটেক আনন্দ স্কুলশিক্ষক জাহানারা বেগম জানান, 'আমাদের স্কুলে অনেক মেধাবী ছাত্র আছে, কিন্তু তাদের বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। শহরের অন্য ছাত্রদের সঙ্গে একই প্রশ্নপত্রে প্রতিযোগিতা করা তাদের জন্য কঠিন।'

শিক্ষাবিদদের মতে, যখন একই কাঠামোয় শহরের বিত্তশালী ও গ্রামের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের দাঁড় করানো হয়, তখন মেধার চেয়ে অর্থনৈতিক সামর্থ্যই বড় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে একটি রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা অনিচ্ছাকৃতভাবেই শিক্ষাগত বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

স্বজনপ্রীতি ও বঞ্চনার চোরাস্রোত : বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিকের অভিভাকদের অভিযোগ থাকে, তাদের ছেলেমেয়ে ক্লাসে ভালো ফল করে, কিন্তু তাকে বৃত্তির তালিকায় রাখা হয়নি। যারা স্কুল শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে, তাদেরই বেশি সুযোগ দেওয়া হয়।

অবশ্য ভিন্নমত দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা সাধারণত ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদেরই বাছাই করি, তবে অভিযোগ যে একেবারেই নেই তা বলব না।'

শিক্ষাবিদদের মতে, নির্বাচনের প্রক্রিয়া যদি স্বচ্ছ না হয়, তাহলে প্রকৃত মেধাবীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বঞ্চিত হতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে যায়।

প্রয়োজনকে গুরুত্ব : শিক্ষাবিদদের একটি অংশ মনে করেন, বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা কার্যকর হতে পারে। শিক্ষাবিদ ড. মনজুর আহমেদ বলেন, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা দিতে হলে আলাদা পরীক্ষা নয়, বরং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তথ্য ব্যবহার করা উচিত।

তার কথায় সায় দিয়ে গৃহস্থালিশ্রমিক আলতাফুন নেসা বলেন, 'যদি সরকার আমাদের মতো পরিবারের তালিকা ধরে সরাসরি সাহায্য দিত, তাহলে মেয়ের পড়াশোনা চালাতে সুবিধা হতো। পরীক্ষার চাপও থাকত না।'

এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, পরিবারভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে প্রকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সম্ভব। এতে সহায়তা লক্ষ্যভিত্তিক হবে।

ড. মনজুর আহমেদের মতে, পরীক্ষার নামে মানসিক চাপ বাড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিলে যেমন বৈষম্য কমবে, তেমনি কোচিংনির্ভর সংস্কৃতিও হ্রাস পাবে।

তিনি বলেন, একটি জাতির মেরুদণ্ড তার শিক্ষা ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থায় যদি শৈশবেই প্রতিযোগিতার চাপ, বৈষম্য ও বাণিজ্যিকীকরণ ঢুকে পড়ে, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। শিশুর হাতে পরীক্ষার ভার নয়, বরং আনন্দময় শিক্ষার উপকরণ তুলে দেওয়াই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক শিক্ষানীতি

প্রণয়ন এবং প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করলেই সার্থক হবে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য- আর মুক্তি পাবে হাজারো শিশুর রুদ্ধ শৈশব।